

শারহুল আক্বীদা আত-ত্বাহীয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৪৬. আল্লাহ তা‘আলা আদম এবং তার সন্তানদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তা সত্য (وَالْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ حَقًّا)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনে আবীল ইয় আল-হানাতী (রহিমাল্লাহু)

আল্লাহ তা‘আলা আদম এবং তার সন্তানদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তা সত্য - ২

অতঃপর ইমাম ইবনে আবীল ইয় রহিমাল্লাহু বলেন, প্রথম মতটি অর্থাৎ যদি বলা হয় প্রকৃত পক্ষেই আল্লাহ তা‘আলা আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরকে বের করেছেন এবং তাদেরকে পরস্পরের উপর সাক্ষী বানিয়েছেন, তাহলে এতে দু’টি আশ্চর্যজনক বিষয় আবশ্যিক হয়।

(১) সমস্ত মানুষ তখন কথা বলেছে এবং রবের প্রতি ঈমানের স্বীকৃতি দিয়েছে, এর মাধ্যমে তাদের উপর কিয়ামতের দিন হুজ্জত কায়েম হবে।[11]

(২) আয়াতটি প্রমাণ করে যে, আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকেই তার বংশধরকে বের করা হয়েছে।

আসলে একাধিক কারণে আয়াত তা প্রমাণ করে না।

(১) আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করেছেন। আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছে, এ কথা বলা হয়নি।

(২) তিনি বলেছেন যে, তাদের বংশধর বের করেছেন। তার পৃষ্ঠ দেশ থেকে বের করা হয়েছে, -এটি বলা হয়নি। এটিকে আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় بدل البعض অথবা الاشتمال বলা হয়। আর বাদলুল ইশতেমাল হওয়াই অধিক উত্তম।

(৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, তাদের বংশধরদেরকে বের করেছেন। তার বংশধরদেরকে বের করা হয়েছে, এ কথা বলা হয়নি।[12]

(৪) আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ “তাদেরকে তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী বানিয়েছেন”। সাক্ষীদাতার জন্য সাক্ষ্যের বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যিক। মানুষ শুধু দুনিয়াতে আগমন করার পর যে সাক্ষ্য দেয় তাই স্মরণ করে। এর আগের সাক্ষ্যের কথা তো কেউ মনে করছে না।

(৫) আল্লাহ তা‘আলা এখানে সাক্ষ্য দেয়ার হিকমত সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। আর তা হলো এর মাধ্যমে তিনি কিয়ামতের দিন মানুষের উপর দলীল কায়েম করবেন। যাতে কিয়ামতের দিন তারা এ কথা বলতে না পারে, إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ “আমরা তো এ কথা জানতাম না”। অথচ দলীল-প্রমাণ তো কায়েম করা হবে রসূলগণকে পাঠানোর মাধ্যমে এবং সেই ফিতরাতের মাধ্যমে যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

“সুসংবাদ দাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ

আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”। (সূরা আন নিসা ৪:১৬৫)

(৬) এ আয়াতে তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে কিয়ামতের দিন এ কথা না বলে যে, **إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ** “আমরা তো এ কথা জানতাম না” (সূরা আরাফ: ১৭২)। আর এটি জানা কথা যে, আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা এবং সে সময় তাদের থেকে অঙ্গিকার নেয়ার কথা কোনো মানুষই জানে না।[13] সুতরাং কেউ তো এটি স্মরণ করছে না।

(৭) আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ

“অথবা তোমরা এ কথা বলতে না পারো যে, শিরকের সূচনা তো আমাদের বাপ-দাদারা আমাদের পূর্বেই করেছিলো এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশে আমাদের জন্ম হয়েছে। তবে কি বাতিলপন্থীরা যে অপরাধ করেছিল সে জন্য তুমি আমাদের ধ্বংস করছো?”। (সূরা আল ‘আরাফ ৭ : ১৭৩)

এখানে সাক্ষ্য গ্রহণের মধ্যে দু’টি হিকমত উল্লেখ করা হয়েছে।

(ক) যাতে তারা অজ্ঞতার অযুহাত পেশ করতে না পারে।

(খ) বাপ-দাদাদের তাকলীদ তথা অন্ধ অনুসরণের অযুহাতও যেন পেশ করতে না পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি গাফেল, তার কোনো অনুভূতি থাকে না। আর মুকাল্লিদ অন্যের অনুসরণ করে। এ দু’টি হিকমত বাস্তবায়ন করার জন্য রসূল পাঠানো এবং তাওহীদের উপর সৃষ্টি করে দলীল-প্রমাণ কায়েম করার প্রয়োজন ছিল।[14]

(৮) আল্লাহ তা‘আলা বলেন, **أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ** “তবে কি বাতিলপন্থীরা যে অপরাধ করেছিল সে জন্য তুমি আমাদের ধ্বংস করছো?” (সূরা আরাফ:১৭৩)।

অর্থাৎ বাপ-দাদাদের কুফুরী ও শির্ক করার কারণে যদি আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে শাস্তি দেন তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! বাতিলপন্থীরা যে অপকর্ম করেছে, তার কারণে কি তুমি আমাকে শাস্তি দিবে? আমরা তো বাতিলপন্থী নই। বরং আমরা তো কেবল মুকাল্লিদ। আমাদের বাপ-দাদারা শির্ক করেছে। আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর। তাই আমরা শিরকের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছি। সুতরাং অন্যের অপরাধের কারণে কিভাবে আমাদেরকে শাস্তি দিবেন?

অথচ আল্লাহ তা‘আলা তাকলীদের কারণে কাউকে শাস্তি দিবেন না। তিনি কেবল শাস্তি দিবেন রসূলদের বিরোধীতা করার কারণে এবং তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করার কারণে। আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি জনপদগুলোকে যুলুম সহকারে ধ্বংস করেন না যতক্ষণ না সেখানকার অধিবাসীরা প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত হয়”। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা রসূল পাঠানোর মাধ্যমে সতর্ক করা এবং সকল প্রকার ওয়র-অযুহাত দূর করার পরই জনপদগুলোকে ধ্বংস করেন।

(৯) আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা‘আলা দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষ থেকেই এ সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি নিয়েছেন যে, তিনি তার প্রভু ও স্রষ্টা। তার কিতাবের অনেক জায়গাতেই তিনি এ স্বীকারোক্তি ও সাক্ষ্যের দ্বারা দলীল-পত্র কায়েম করেছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

“এবং তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করো কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন? তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ।
(সূরা লুকমান: ২৫)

এ সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তির বিষয়কেই তাদের উপর তাদের সাক্ষী বানানো হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রসূলগণ এ সাক্ষ্যের কথাই তাদের জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

“তাদের রসূলগণ বলেছে, আল্লাহর ব্যাপারে কি সন্দেহ আছে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা?” (সূরা ইবরাহীম: ১০)

(১০) আল্লাহ তা‘আলা মানুষের অন্তরে তার অস্তিত্ব ও তাওহীদে রুবুবীয়াতের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শন স্থাপন করেছেন। এ দলীলগুলো আল্লাহ তা‘আলার তাওহীদ ও উলুহীয়াতকে আবশ্যক করে। আল্লাহ তা‘আলার আয়াত ও নিদর্শনগুলো এ রকম। এগুলো তাওহীদের প্রমাণ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“এভাবে আমি নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে পেশ করে থাকি। আর এ জন্য করে থাকি যাতে তারা ফিরে আসে” [15]
(সূরা আল আরাফ: ১৭৪)

এখানে নিদর্শন বলতে ঐ ফিতরাত উদ্দেশ্য, যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাত তথা তাওহীদের উপর জন্মগ্রহণ করে। এ ফিতরাত ব্যতীত অন্য কিছু উপর কোনো শিশুই জন্ম গ্রহণ করে না। এটি একটি মীমাংসিত বিষয়। এতে কোনো রদবদল নেই। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

ইমাম ইবনে আতীয়া এবং অন্যান্য ইমামগণ এ অর্থটি বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তারা ঐ হাদীছগুলোর প্রকাশ্য অর্থ স্বীকার করতে ইতস্তবোধ করেছেন, যাতে সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত বনী আদমকে তাদের বাপদাদাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করেছেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী বানিয়েছেন। অতঃপর যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়েছেন। শাইখ আবু মানসুর মাতুরীদি রহিমাহুল্লাহ শারহুত তাবীল গ্রন্থে এ উভয় মতই উল্লেখ করেছেন। উভয় মত উল্লেখ করার পর তিনি দ্বিতীয় মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ রূহ জগতে আল্লাহ তা‘আলা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদেরকে বের করে তাদের থেকে সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি নেয়ার মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত কথা বলার পর তিনি এ দিকেই ঝুকে পড়েছেন।

নিঃসন্দেহে তাওহীদে রুবুবীয়াতের স্বীকৃতি প্রদান করা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব। তাদের মধ্যে শির্ক প্রবেশ করে বাইরে থেকে। সন্তানেরা বাপদাদাদের তাকলীদ করেই শির্ক করে থাকে। কিয়ামতের দিন যখন তারা এ বলে ঝগড়া করবে যে, তাদের বাপদাদারা শির্ক করেছিল। আর তারা বাপদাদাদের অনুসরণ করেই শির্ক করেছে। যেমন পানাহার, বাসস্থান ও পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে সন্তানেরা পিতাদের অনুসরণ করে থাকে তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তো স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করতে। আরো স্বীকার করতে যে, আল্লাহ তা‘আলাই তোমাদের রব, তার কোনো শরীক নেই। তোমরা নিজেদের উপর নিজেরাই সাক্ষ্য দিয়েছো। কোনো মানুষ নিজের উপর কোনো

বিষয়ের স্বীকৃতি প্রদান করাকেই সাক্ষ্য প্রদান বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

“হে ঈমানদারগণ! ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষী হয়ে যাও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হয়”। (সূরা আন নিসা: ১৩৫)

এখানে এভাবে বলা উদ্দেশ্য নয় যে, আমি নিজের উপর এ সাক্ষ্য দিচ্ছি। বরং যে ব্যক্তি কোনো বিষয় স্বীকার করলো, সে নিজের উপর তার সাক্ষ্য দিল। সুতরাং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যেহেতু তাওহীদ সম্পর্কে জানতে পেরেছো, তার স্বীকৃতি প্রদান করেছো এবং তার উপর নিজেরাই সাক্ষ্য দিয়েছো, তাই সে স্বীকৃতি থেকে সরে এসে শিরকের দিকে গেলে কেন? শুধু তাই নয়; জ্ঞাত ও নিশ্চিত বিষয়কে ছেড়ে অবাস্তব জিনিসের দিকে কেন গেলে? তোমরা কেন এমন লোকদের তাকলীদ করে শির্ক করতে গেলে, যাদের সাথে কোনো দলীল-প্রমাণ নেই। তবে পার্থিব জীবনের বিষয়াদির কথা ভিন্ন। এতে বাপদাদাদের তাকলীদ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। দুনিয়াবী বিষয়াদির ক্ষেত্রে বাপদাদাদের তাকলীদ করার মধ্যেই সন্তানদের কল্যাণ রয়েছে। তবে তাদের তাকলীদ করে শির্ক করা মোটেই উচিত হয়নি। কেননা তোমাদের কাছে তাওহীদের ইলম ছিল এবং তোমরা নিজেরাই নিজেদের উপর সাক্ষ্য দিয়েছিলে যে আল্লাহই তোমাদের রব। এ সাক্ষ্য দেয়াই শিরকের অসারতাকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দেয়। সেই সঙ্গে তোমাদের অবস্থা আরো সুস্পষ্ট করে দেয় যে, তোমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছো।

শিশু তার পিতা-মাতা থেকে যে দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তা হলো প্রশিক্ষণ এবং অভ্যাসগত দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থা। দুনিয়ার কল্যাণ অর্জন ও স্বার্থ লাভ করার জন্যই শিশু তার পিতা-মাতার অনুসরণ করে। কেননা শিশুর জন্য একজন পরিচর্যাকারী ও প্রশিক্ষক আবশ্যিক। পিতা-মাতাই শিশুর পরিচর্যা করার সর্বাধিক উপযোগী। এ জন্যই ইসলামী শরীয়তের বিধানে দুনিয়ার বাহ্যিক হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে শিশু পিতা-মাতার দ্বীনের অনুগামী হয়ে থাকে। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এ দ্বীনের উপর কোনো শিশু মারা গেলে আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দিবেন না। তবে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর সে বিবেকবান হলে এবং তার উপর দলীল-প্রমাণ কায়েম করা হলে তার উপর অহী এবং বিবেক-বুদ্ধি ভিত্তিক দ্বীনের অনুসরণ করা আবশ্যিক। বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে জানা যায় যে, নাবী-রসূলগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাওহীদের যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন এবং আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশে তাদের থেকে তাওহীদের যেই স্বীকৃতি নিয়েছেন, তাই সঠিক দ্বীন।

ঐ দিকে পিতা-মাতা যদি সঠিক দ্বীনের অনুসারী হয়ে থাকে, তাহলে শিশুও সঠিক দ্বীনের অনুসারী হয়। যেমন সত্যবাদী ইউসুফ তার পিতাদের দ্বীনের অনুসারী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

“আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের দ্বীন অনুসরণ করেছি” (সূরা ইউসুফ:৩৮)। ইয়াকুব আলাইহি সালাম তার সন্তানদেরকে বলেছেন,

مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِلَّهِ أَبَائُكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

“আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা সবাই জবাব দিল আমরা সেই এক আল্লাহর ইবাদত করবো, যাকে আপনি এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক ইলাহ হিসেবে মেনে এসেছেন আর আমরা তারই অনুগত মুসলিম”। (সূরা আল বাকারা: ১৩৩) তবে শিশুর বাপ-দাদারা যদি নাবী-রসূলের বিরোধী হয়,

তাহলে শিশুর উপর বাপদাদাদের অনুসরণ পরিত্যাগ করে নাবী-রসূলদের অনুসরণ করা আবশ্যিক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

“আমি মানুষকে নিজের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু যদি তারা তোমার উপর চাপ দেয় যে, তুমি এমন কিছুকে আমার সাথে শরীক করো যাকে তুমি আমার শরীক হিসেবে জানো না, তাহলে তাদের আনুগত্য করো না”। (সূরা আনকাবুত: ৮)

সুতরাং যে ব্যক্তি না জেনে ও না বুঝে বাপদাদার অনুসরণ করলো এবং তার নিকট সুবিদিত সত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পরও তা থেকে সরে দাঁড়ালো না সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

“তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন তা মেনে চলো, জবাবে তারা বলে আমাদের বাপ-দাদাদের যে পথের অনুসারী পেয়েছি আমরা সে পথেই চলবো। যদিও তাদের বাপ-দাদাদের বিবেক-বুদ্ধি ছিল না এবং তারা সুপথগামী ছিল না তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে?” (সূরা বাকারা: ১৭০)

যারা ইসলামী সমাজে এবং ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের অনেকের অবস্থা ঠিক এ রকম। তাদের কেউ তার পিতার অনুসরণ করে। তার বাপ-দাদারা যে আক্বীদাহ ও মাযহাবের অনুসরণ করেছে, সেও তার অনুসরণ করতে চায়। যদিও সে আক্বীদাহ ও মাযহাব ভুল হয়ে থাকে এবং তার বাপদাদারা তাতে পূর্ণ প্রজ্ঞার উপর না থাকে। বরং তারা শুধু মুসলিমদের ঘরে জন্মগ্রহণকারী হিসাবে মুসলিম ছিল। জেনে-বুঝে ও দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করে তারা দ্বীন ইসলামকে পালন করেনি। এ ধরনের লোককে যখন কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে, **من ربك** তোমার প্রভু কে? জবাবে সে বলবে, হায় আফসোস! আমি তো এটি জানি না। লোকদেরকে একটি কথা বলতে শুনতাম। আমিও তা বলেছি।

সুতরাং বুদ্ধিমান লোকের উচিত এবিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, নিজেকে নসীহত করা এবং আল্লাহ তা‘আলার পথে চলা। সে যেন গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখে এবং নির্ধারণ করে সে কোন্ দলের অন্তর্ভুক্ত? আল্লাহ তা‘আলাই তাওফীক প্রদানকারী। তাওহীদে রুবুবীয়াত সাব্যস্ত করার জন্য কোনো প্রকার দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন হয়না। মানুষের জন্মগত স্বভাবের মধ্যেই তাওহীদে রুবুবীয়াত ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। স্রষ্টার নিদর্শন ও তাওহীদের দলীল-প্রমাণ খুঁজে বের করার জন্য মানুষের সর্বপ্রথম দৃষ্টি দেয়া দরকার তার নিজের মধ্যে। সে ছিল এক সময় নগণ্য শুক্রবিন্দু। যা বের হয়েছে পিতার পৃষ্ঠদেশ ও মাতার বক্ষদেশ থেকে। অর্থাৎ মায়ের বুকের হাড়ডী থেকে। অতঃপর সেই শুক্রবিন্দু তিনটি অঙ্গকারের মধ্যে একটি সংরক্ষিত স্থানে রাখা হয়েছে। সেখানে পিতা-মাতা এমনকি সমস্ত সৃষ্টিকূলের কারো তদবীরের প্রয়োজন হয়নি। এ শুক্রবিন্দুটি যদি মায়ের গর্ভাশয়ের বাইরে কোনো পাত্রের মধ্যে কিংবা সংরক্ষিত স্থানে রেখে তাকে মানব আকৃতি প্রদান করার জন্য দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞানী লোক এক জোট হয়ে চেষ্টা করতো, তাহলেও তারা তাকে মানব আকৃতি দিতে সক্ষম হতো না। এতে প্রকৃতির কোনো প্রভাব নেই।[16] সম্পূর্ণরূপে স্রষ্টার কুদরতই এখানে কার্যকর হয়। কেননা শুক্রবিন্দু প্রথমে সম্পূর্ণ মৃত থাকে। এতে কোনো জীবন থাকে না। আসলে মৃতের কোনো কাজ ও তদবীর থাকে না। অর্থাৎ মৃত শুক্রবিন্দু থেকে সুন্দর আকৃতির মানুষ তৈরী হওয়া কিংবা প্রাণী জগৎ তৈরী হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

যে ব্যক্তি মাতৃগর্ভের শুক্রকীট নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে এবং এক স্তর থেকে অন্য স্তরে তার রূপান্তরের

বিষয়টির প্রতি গভীর দৃষ্টি দিবে সে এর মধ্যে তাওহীদে রুবুবীয়াতের দলীল-প্রমাণ খুঁজে পাবে। তাওহীদে রুবুবীয়াই বান্দাকে তাওহীদে উলুহীয়াতের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির দলীলের মাধ্যমে যখন কেউ জানতে পারবে যে, তার এমন এক মহান প্রভু রয়েছেন, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন সে তাকে বাদ দিয়ে কিভাবে অন্যের ইবাদত করতে পারে!! আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে বান্দা যতই চিন্তা-গবেষণা করবে, ততই স্রষ্টার প্রতি তার ইয়াকীন বৃদ্ধি পাবে এবং তাওহীদ সম্পর্কেও তার গভীর জ্ঞান লাভ হবে। বান্দা নিশ্চিতভাবেই জানতে পারবে যে, আল্লাহ ছাড়া তার আর কোনো প্রভু নেই এবং তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই। আল্লাহ তা‘আলাই তাওফীক দাতা।

ফুটনোট

[11]. আসলে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। মানুষ তখন কথা বলেছে এবং ঈমানের স্বীকৃতি দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ কথা কুরআনে বলেছেন। সহীহ হাদীছে এর ব্যাখ্যা এসেছে। আল্লাহ তাআলা রুহ সৃষ্টি করেছেন এবং কথা বলিয়েছেন। যেমন তিনি অন্যান্য সৃষ্টিকে কথা বলিয়ে থাকেন।

[12]. এ তিনটি কথার মাধ্যমে ইমাম ইবনে আবীল ইয় রহিমাহুল্লাহ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আদমের সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকেই তাদের বংশধরকে বের করা হয়েছে। আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে নয়। কেননা বহুবচনের শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করার কারণে বুঝা যায় যে, পিতাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে পুত্রদেরকে বের করা হয়েছে। এভাবে বনী আদমের সর্বশেষ লোকসমূহকে বের করা হয়েছে। আর যদি বলা হতো আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছে, তাহলে শুধু আদম থেকে সরাসরি জন্মগ্রহণ করেছে, তাদেরকেই বুঝানো হতো। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরদেরকে বুঝানো হতো না।

[13]. দু’ভাবে এ কথার জবাব দেয়া যেতে পারে। এখানে বের করা ও সাক্ষী বানানো সম্পর্কে গাফেল থাকলেও তাওহীদ সম্পর্কে তারা গাফেল ছিল না। বের করা ও সাক্ষী বানানোর উদ্দেশ্য এটিই। সুতরাং কিয়ামতের দিন তারা যেন এ কথা বলতে না পারে যে, আমরা তাওহীদ সম্পর্কে গাফেল ছিলাম। কেননা তাদের সৃষ্টিগত স্বভাবের মধ্যেই তাওহীদ রয়েছে। দ্বিতীয় জবাব হলো, দুনিয়ার জীবনে বের করা ও তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদানের কথা মনে না থাকলেও আখেরাতে স্মরণ করা এবং স্বীকার করা অসম্ভব নয়। অথবা অহংকারের কারণে তাদের কেউ কেউ অস্বীকার করতেও পারে। অথচ উচিত ছিল স্মরণ করা।

[14]. বস্তুত রসূল পাঠানো, তাওহীদের উপর সৃষ্টি করা এবং সাক্ষ্য নেয়া সবগুলোই ধর্তব্য। এখানে কোনো পারস্পরিক বৈপরিত্য নেই।

[15]. অর্থাৎ বিদ্রোহ ও বিকৃতি -বিভ্রান্তির নীতি পরিত্যাগ করে বন্দেগী ও আল্লাহর আনুগত্যের আচরণের দিকে যেন ফিরে আসে।

[16]. শাইখ এখানে ঐসব প্রকৃতি বাদীদের জবাব দিয়েছেন, যারা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। যারা মনে করে

সবকিছু প্রকৃতির নিয়মে কিংবা এমনিতেই সৃষ্টি হয়। শাইখ এখানে তাদের জবাব দিয়েছেন। মাতৃগর্ভে শুক্রকীট থেকে সুন্দর মানুষ তৈরীর বিষয়টি প্রকৃতিবাদীদের ভ্রান্ত ধারণাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। এটি মহান স্রষ্টার সীমাহীন কুদরত এবং সুনিপুন কৌশলের প্রমাণ বহন করে। তিনটি অঙ্ককারের মধ্যে তুচ্ছ মৃত একটি শুক্রকীট থেকে এত সুন্দর গঠনের মানুষের সৃষ্টিকে যারা প্রকৃতির নিয়মের দিকে সম্বন্ধ করে, তারা মূর্খ ছাড়া আর কিছু নয়। মূলত গ্রীক দর্শন থেকে প্রকৃতি বাদের ধারণা এসেছে। মূর্খ-অজ্ঞ মূর্তিপূজক গ্রীক জাতিই সর্বপ্রথম সৃষ্টিজগতের সবকিছুকে প্রকৃতির দিকে সম্বন্ধ করার ধারণা উদ্ভাবন করে।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8952>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন